পারে। সহজেই বোঝা যায় যে স্বধর্ম বাস্তবিক বর্ণাশ্রম ধর্মেরই নামান্তর।

আশ্রম ধর্ম

'আশ্রম' শব্দটি জীবনের এক একটি অধ্যায়কে বোঝায়। প্রাচীন ভারতে মানুষের সমস্ত জীবনকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারটি আশ্রম লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে মোক্ষ লাভ করাকেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সেইজন্য জীবনের নানা প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয়নি। মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি লাভ করবে —একথা যেমন সত্য সেইরকম তার যে একটি জৈব সত্তা আছে সেকথাও একইভাবে সত্য। মানুষের জীবন এই জৈব সত্তা থেকে পারমার্থিক সত্তায় উত্তরণের ইতিহাস। চারটি আশ্রমধর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের সেই উত্তরণ ঘটে।

আশ্রমধর্ম **বলতে প্রতিটি আশ্রমের কর্তব্যকে বোঝায়।** মানুষ জীবনের এক একটি পর্যায়ে এক একটি আশ্রমে অবস্থান করে। আশ্রমভেদে তার কর্তব্যও ভিন্ন হয়। একটি আশ্রম ধর্ম পালন করে মানুষ তার পরবর্তী আশ্রমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়। চারটি আশ্রম অতিক্রম করে মানুষ মোক্ষলাভ করে।

ব্রহ্মচর্য — ব্রহ্মচর্যই মানুষের সমগ্র জীবনের ভিত্তি রচনা করে। ব্রহ্মচর্যকে মানুষের শিক্ষালাভের অধ্যায় বলা হয়েছে। গুরুগৃহে বেদবিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে ব্রহ্মচারীর চরিত্র গঠিত হয়। আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয় সংযমের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠিত হয়। চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে প্রাক্‌বিবাহের সংযত জীবনকে যদিও ব্রহ্মচর্য বলা হয়; তাহলেও 'ব্রহ্মচারী' শব্দটির আর একটি প্রসিদ্ধ অর্থ আছে। "ব্রহ্মাণি চরতি ইতি ব্রহ্মচারী" — সেই ব্যক্তিকেই ব্রহ্মচারী বলা যায় যে জীবনের সমস্ত কর্মের মধ্যেও ব্রহ্মভাবনায় লীন থাকে। অবশ্য এর জন্য মানুষকে সংযতেন্দ্রিয় হতে হবে। সংযত জীবনে প্রাণশক্তির স্ফূরণ হয় যা মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন পথে নিয়ে যেতে পারে।

গার্হস্থ — ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অবসানে মানুষ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করে। গৃহাশ্রমে বিবাহিত জীবন বা সংসার জীবনকে গার্হস্থাশ্রম বলা হয়। এই আশ্রমে প্রবেশ করে মানুষ ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। বংশধারাকে অব্যাহত রেখে মানবজাতির প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখা গার্হস্থাশ্রমের কর্তব্য। সাংসারিক বা পারিবারিক জীবন মানুষের জৈব তৃষ্ণা নিবৃত্তির স্থান নয়। সংযত বিবাহিত জীবনযাপন করে মানুষ নিজেকে পরবর্তী আশ্রমের জন্য প্রস্তুত করে।

প্রতিটি আশ্রমেই যেহেতু মোক্ষ লাভের প্রস্তুতি চলে তাই ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি এখানে সংযত। এই আশ্রমে বংশবৃদ্ধি ছাড়াও মানুষকে আরও বহুবিধ কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন পিতামাতার সেবা, সন্তানের প্রতিপালন, অতিথিসেবা, দেবপূজা ইত্যাদি। মানুষ এই গার্হস্থ আশ্রমেই তার মৌলিক ঋণশোধ করার চেষ্টা করে — যেমন, দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ। প্রত্যেক মানুষই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। সূর্য, বায়ু, বৃষ্টি, অগ্নি ইত্যাদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। প্রকৃতি নানা দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত। দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যাগযজ্ঞের মাধ্যমে মানুষ দেবঋণ পরিশোধ করে। তাছাড়া উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়েও মানুষ দেবঋণ পরিশোধ করে।

সন্তান উৎপাদন করে বংশধারাকে অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে মানুষ গার্হস্থ জীবনে পিতৃঋণ শোধ করে। বেদাধ্যয়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঋষিঋণ শোধ হয়। এইভাবে জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং সংস্কৃতি অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচে।

গার্হস্থ আশ্রমে মানুষকে নানাবিধ মহাযজ্ঞ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে —যেমন, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞের অর্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সেবা করা এবং তাদের সংরক্ষণ করা। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবা করাই মনুষ্যযজ্ঞ। দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রকৃতির সেবাই দেবযজ্ঞ। পিতৃযজ্ঞের অর্থ পূর্বপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন এবং তাঁদের স্মরণ, কারণ তাঁরাই আমাদের যাবতীয় মঙ্গলের জন্য দায়ী। পবিত্র গ্রন্থাদি পাঠের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মযজ্ঞ করা হয়। গার্হস্থ আশ্রমে এই সমস্ত যজ্ঞ পালনই কর্তব্য।

বানপ্রস্থ — গার্হস্থ জীবন সার্থকভাবে সমাপ্ত হলে মানুষ তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থে প্রবেশ করে। বাণপ্রস্থে মানুষ যেন স্বেচ্ছানির্বাসনে যায়। গার্হস্থ আশ্রমে জীবনের ভোগ ও নানা কর্তব্য সমাপ্ত হলে মোক্ষলাভের প্রয়োজনে মানুষ কৃচ্ছ-সাধনে ব্রতী হয়। কৃচ্ছতায় মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয়, নিরাসক্তি আসে এবং সে তখন ত্যাগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য চিত্ত-শুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধ হলে মানুষ সাধনমার্গের উচ্চতম স্তর সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়।

সন্ন্যাস — সন্ন্যাসের মধ্য দিয়ে বানপ্রস্থ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা গৃহে অবস্থান করেন না। বিচরণ-ই যেহেতু সন্ন্যাস আশ্রমের রীতি তাই সন্ন্যাসকে প্রবজ্যা বলা হয়। যিনি প্রবজ্যা গ্রহণ করেন তিনি গৃহহীন বা অনিকেত। উপনিষদে সন্ন্যাসের লক্ষণে বলা হয়েছে যে, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করেন, যিনি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করেন তিনিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর জীবন নিরাসক্তির সাধনায় নিমগ্ন থাকে।

একটি সমস্যা — সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্মকে কেন্দ্র করে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে কোন্ ধর্মটি পালনীয় তার নির্দেশ পাওয়া কঠিন। যেমন, কৈকেয়ী রামকে বনবাসে প্রেরণ করার এবং ভরতের সিংহাসন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করলে লক্ষ্মণ সক্রোধে বলেন যে রামের সিংহাসন যদি অন্য কেউ অধিকার করে তাহলে তিনি তাকে হত্যা করবেন। রাম তখন তাঁকে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করতে নিষেধ করেন অর্থাৎ তিনি অগ্রজের সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করার জন্য ক্ষত্রিয়ের মত শৌর্য প্রদর্শনে উদ্যত হলে রাম তাঁকে সাধারণ ধর্ম পালন করতে নির্দেশ দেন। সাধারণ ধর্ম এই যে পিতৃসত্য পালন করাই পুত্রের ধর্ম। এইভাবে এখানে রাম বর্ণাশ্রমধর্মের তুলনায় সাধারণ ধর্মকেই বলবান বলে উল্লেখ করেন।

আবার গীতায় দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করছেন কারণ যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম বা স্বধর্ম। কিন্তু অর্জুনের মতে যুদ্ধে যোগদান করলে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম লঙ্ঘন করা হবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ ধর্মের তুলনায় বর্ণধর্মকেই বলবান বলে উল্লেখ করেছেন।

যখন বর্ণধর্ম ও সাধারণ ধর্মের মধ্যে বিরোধ হয় তখন সেই বিরোধের নিষ্পত্তি কিভাবে হবে সে বিষয়ে গীতায় কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় যে পরিস্থিতি সাপেক্ষে একটি ধর্ম অপর ধর্মকে অতিক্রম করে যেতে পারে।

অর্থ